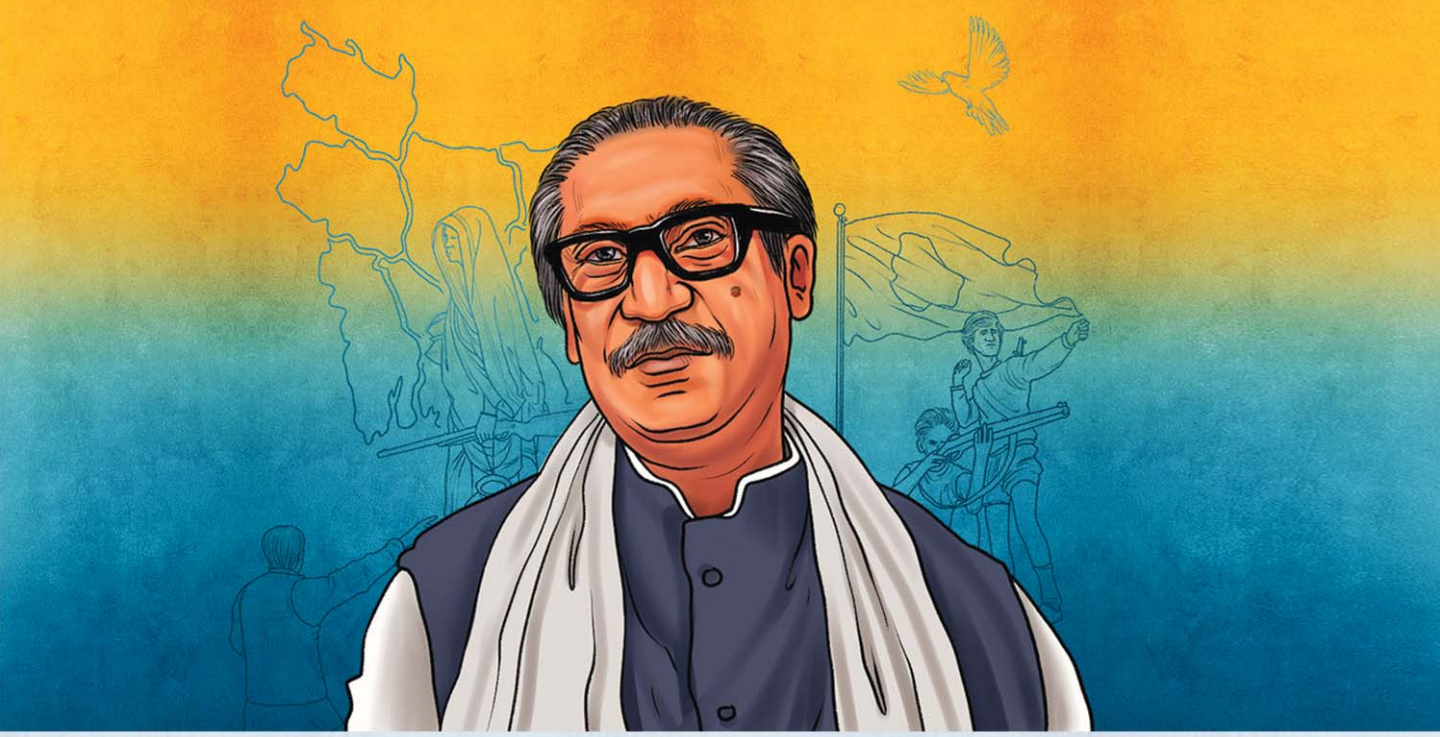

ততকাল রবে কীর্তি তোমার...

প্রভাষ আমিন

যতবার যাই, বনানী কবরস্থানে ঢুকতে গেলেই আমি থমকে যাই। বনানী কবরস্থানে ঢুকতেই হাতের বাঁদিকে এক সারি কবরের সামনে গিয়ে থমকে দাঁড়াই, ক্ষুব্ধ হই। সেখানে নামফলকে ১৮ জনের নাম লেখা, প্রথম নামটি বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব, শেষ নামটি পোটকা। তারপরও লেখা নিচে 'ও নাম না জানা আরো অনেকে'। ৪৮ বছর আগের ঘটনা। কিন্তু নিষ্ঠুরতা, নির্মমতাটি এখনও টাটকা। যতবার দেখি ততবার ফিরে আসে শোকের সেই বাণ। অনেকবার আমি ধানমন্ডি ৩২ নম্বরের সেই বাড়িটিতে গেছি। বাড়িটির কোণে কোণে নিষ্ঠুরতার চিহ্ন, শোকের আবহ। যতবার গেছি, শোকের পরিমাণ একটুও কমেনি। ধানমন্ডির ৩২ নাম্বারের বাড়িটি এখন জাদুঘর। জাদুঘর হওয়ার আগে পরে আমি অনেকবার এই বাড়িটিতে গিয়েছি। বাড়িটির প্রতিটি কোণায় নৃশংসতার চিহ্ন। সেই ভয়াবহ সিঁড়িটির সামনে গিয়ে আমি শোকে, বিস্ময়ে থমকে যাই। এই সিঁড়িতে বঙ্গবন্ধুর মরদেহ রেখেই আওয়ামী লীগের কেউ কেউ বেঈমান খন্দকার মোশতাকের মন্ত্রিসভায় যোগ দিতে বঙ্গভবনে ছুটে গিয়েছিলেন। তবে ৩২ নাম্বারের বাড়িটিতে গেলে শোকের পাশাপাশি আমি দেখি একজন রাষ্ট্রপতির ঘরের ছবি। আমি বিস্ময় মানি। ড্রইং রুম, বেডরুম, ডাইনিং রুম ঘুরে ঘুরে দেখি আর ভাবি; আরে এ তো আমাদেরই রুম, কোনো আড়ম্বর নেই, জৌলুশ নেই। আর দশটা বাঙালি পরিবারের মতোই ঘরের কোণায় কোণায় রুচির ছাপ।

বঙ্গবন্ধুর জীবনের চারভাগের এক ভাগই কেটেছে কারাগারে। ৫৭ দফায় প্রায় ১৩ বছর কারাগারে ছিলেন বঙ্গবন্ধু। তাঁর অনুপস্থিতিতে বিরূপ সময়ে সন্তানদের নিয়ে বেগম মুজিবকে এ বাসা ও বাসা করে কাটাতে হয়েছে। সেই সময়ে তিল তিল করে বেগম মুজিব গড়ে তুলেছিলেন এই অতি সাধারণ বাড়িটি, যেটি হয়ে উঠেছিল বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের সূতিকাগার। স্বাধীনতার পর জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান চাইলে সুরক্ষিত বঙ্গভবন বা গণভবনে থাকতে পারতেন। কিন্তু তিনি রয়ে গিয়েছিলেন সেই সাধারণ বাড়িটিতে। উৎখাতের নানা ষড়যন্ত্রের কথা তাঁকে কেউ কেউ বলেছিলেন। কিন্তু বাংলার মানুষ তাঁর বুকে গুলি চালাতে পারে, এটা তিনি বিশ্বাস করেননি। যার বুক ভরা বাংলাদেশের জন্য ভালোবাসা, তাঁর বুকই ঝাঁঝরা হলো বিশ্বাসঘাতক বাঙালির গুলিতে।

বঙ্গবন্ধু জীবনভর বাঙালির জন্য লড়ে গেছেন। একটি জাতি গঠন, সে জাতির বুকে স্বাধীনতার স্বপ্ন বুনে দেওয়ার কৃতিত্ব তাঁর। শুধু স্বপ্ন বুনে দেওয়া নয়; সেই স্বপ্নের বাস্তবায়নে সাহস, বুদ্ধিমত্তা, দূরদর্শিতার এক অসাধারণ মিশেলের নামই বঙ্গবন্ধু। একাত্তরের ৭ই মার্চে অনেকের চাপ ছিল সরাসরি স্বাধীনতা ঘোষণার। সেদিন সরাসরি স্বাধীনতার ঘোষণা দিলে রেসকোর্স ময়দানে রক্তের বন্যা বয়ে যেতো, বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম চিহ্নিত হতো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে, আর বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতাকামী নন, হতেন বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নেতা। ২৫ মার্চ কালরাতে পাকিস্তানী হানাদার বাহিনী যখন নিরস্ত্র বাঙালির ওপর হামলা চালালো, তখন গ্রেপ্তারের ঠিক আগ মুহূর্তে ২৬ মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন বঙ্গবন্ধু। বিশ্বের অনেক দেশ বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা পেলে বর্তে যেতো। এখনও বিশ্বের দেশে দেশে নিপীড়িত মানুষ বঙ্গবন্ধুর মতো একজন নেতা খুঁজে বেড়ায়। আর আমরা সেই বঙ্গবন্ধুকে পেয়েও হারাই। আফসোস করি, যদি রাত পোহালে শোনা যেতো, বঙ্গবন্ধু মরে নাই...।

মুক্তিযুদ্ধে ভারত আমাদের সাহায্য করেছে। এজন্য তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা। তবে ভারতের সেই সাহায্যে স্বার্থও ছিল। চির বৈরী পাকিস্তানকে দুই ভাগ করে দেওয়া তো অবশ্যই ভারতের প্রথম চাওয়া ছিল। স্বাধীন বাংলাদেশে আস্তানা গেঁড়ে বসার গোপন আকাঙ্ক্ষাও হয়তো ছিল। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি বঙ্গবন্ধুর কারণে। বাহাত্তরের ৮ জানুয়ারি পাকিস্তানের কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে যুক্তরাজ্য ও ভারত হয়ে ১০

জানুয়ারি স্বাধীন বাংলাদেশের মাটিতে পা রাখেন স্বাধীনতার মহানায়ক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব। দেশে ফেরার পথে ভারতে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে প্রথম বৈঠকেই বঙ্গবন্ধু জানতে চান, ভারতের সেনারা কবে নাগাদ বাংলাদেশ ছাড়বে। কিছুটা চমকে গেলেও ইন্দিরা গান্ধী ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনেই ভারতের সেনা প্রত্যাহারের অঙ্গীকার করেছিলেন এবং তিনি কথা রেখেছিলেন। বাহাত্তরের ১৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর জন্মদিনেই ভারতের শেষ সৈন্যটি বাংলাদেশের মাটি ত্যাগ করেছিল। যারা ভেবেছিলেন, পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হয়ে বাংলাদেশ ভারতের খপ্পড়ে পড়বে; তাদের ভুল প্রমাণ করেছিলেন বঙ্গবন্ধু। মাত্র তিন মাসের মধ্যে এভাবে সৈন্য প্রত্যাহারের উদাহরণ গোটা বিশ্বেই বিরল। সত্যিই বঙ্গবন্ধু আমাদের ইতিহাসের মহানায়ক। শুধু বাংলাদেশ নয়, বঙ্গবন্ধু সব কালের, সব মানুষের, সব দেশের নিপীড়িত মানুষের নেতা, অনন্ত অনুপ্রেরণা।

এখন বাংলাদেশে লাখ লাখ বঙ্গবন্ধুপ্রেমিক। কিন্তু পঁচাত্তরের ১৫ আগস্টের পর অবস্থাটা ভিন্ন ছিল। ২১ বছর বাংলাদেশে নিষিদ্ধ ছিলেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৯৬ সালে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় আসার পর বাংলাদেশ টেলিভিশনে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ প্রচার করা হয়। তখন দেশজুড়ে দারুণ এক আবেগের ঢেউ খেলে গিয়েছিল। সময়ের কারণে সেই আবেগ অনেকটাই থিতিয়ে এসেছে। আওয়ামী লীগের অতি ব্যবহার আর দলীয়করণই বঙ্গবন্ধুর প্রতি সেই উত্তাল আবেগ থিতিয়ে আসার জন্য কিছুটা দায়ী। তবে বঙ্গবন্ধুর প্রতি সাধারণ মানুষের ভালোবাসা কমেনি। বঙ্গবন্ধুর দুটি বই 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' ও 'কারাগারের রোজনামচা' প্রকাশের পরও আমরা দেখেছি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সর্বস্তরের মানুষের আবেগ কতটা শুদ্ধ। দুটি বইই বাংলাদেশের ইতিহাসে সর্বাধিক বিক্রিত। তবে কতটা পঠিত সে নিয়ে সন্দেহ আছে। পড়লেও আওয়ামী লীগের নেতাকর্মীরা বঙ্গবন্ধুর বই দুটি কতটা আত্মস্ত করতে পেরেছে বা করতে চাইছে, তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। অন্তত এখনকার অনেক নেতাকর্মীর কার্যকলাপ দেখলে মনে হয় তারা বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' কিনেছেন কিন্তু পড়েননি বা পড়েছেন কিন্তু আত্মস্ত করতে পারেননি। সুযোগ থাকলে আমি বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক কর্মীকে বঙ্গবন্ধুর 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী' পাঠ বাধ্যতামূলক করতাম। অজপাড়াগাঁ থেকে উঠে আসা একটি মানুষ কীভাবে একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা ধারণ করতে পারে, এ বইটি পাঠ করলে সবাই তা জানতে পারবে।

আচরণ দলীয় কর্মীর মতো হলেও অনেক সাংবাদিক নিজেদের নিরপেক্ষ দাবি করেন। আমি কখনোই নিজেকে নিরপেক্ষ দাবি করি না। নিরপেক্ষতার ব্যাপারে আমার অবস্থান পরিষ্কার। আমি দলনিরপেক্ষ, তবে আদর্শ নিরপেক্ষ নই। আমি সত্য ও ন্যায়ের পক্ষে। মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে, যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের প্রশ্নে, ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশের প্রশ্নে আমি নিরপেক্ষ নই। আমি মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় একটি সুখী-সমৃদ্ধশালী ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ চাই। আর এমন বাংলাদেশের স্বপ্ন যিনি দেখিয়েছিলেন, সেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব প্রশ্নেও আমার কট্টর পক্ষপাত। আমি নিরপেক্ষতার ভান না ধরে সব সময় বঙ্গবন্ধুর কথা বলি। আমি চাই বাংলাদেশে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বলে কিছু থাকবে না, থাকলেও স্বাধীন বাংলাদেশে তাদের রাজনীতি করার অধিকার থাকবে না। সরকারি দল, বিরোধী দল সবাই হবে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। আমি চাই, জাতির পিতা প্রশ্নে সব রাজনৈতিক দলের অভিন্ন অবস্থান থাকবে।

আমি জানি, একদিন না একদিন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী সর্বজনীনভাবে পালিত হবেই। তবে এখন সর্বজনীনভাবে বঙ্গবন্ধুর মৃত্যুবার্ষিকী পালনের সবচেয়ে বড় বাধা আওয়ামী লীগই। দলটি বঙ্গবন্ধুকে এমনভাবে কুক্ষিগত করে রেখেছে যে, আওয়ামী লীগের বিরোধিতা করতে গিয়ে অনেকেই বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করে ফেলেন। আওয়ামী লীগার হয়ে যাওয়ার ভয়ে অনেকে বঙ্গবন্ধুর ন্যায্য প্রশংসাটাও করেন না। একাত্তরে মুক্তিযুদ্ধের সময় 'জয়বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের রণ স্লোগান। এ দুটি শব্দবন্ধ একসঙ্গে, এক নিঃশ্বাসে উচ্চারিত হতো। কিন্তু আজ বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের অনেকেও 'জয়বাংলা' বলেন, কিন্তু আওয়ামী লীগের সিল লেগে যাওয়ার ভয়ে 'জয় বঙ্গবন্ধু' উচ্চারণ করেন না। এ আসলে আমাদের হীনমন্যতা। বঙ্গবন্ধু আওয়ামী লীগের একার সম্পদ নয়, তিনি জাতির পিতা।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আদিখ্যেতা বেশি হলো, চামড়া বাঁচাতে বিএনপি-জামায়াত থেকে আসা নব্য আওয়ামী লীগার, হাইব্রিড আওয়ামী লীগার আর সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর বিরোধিতা করে আসা রাজনীতিবিদদের মধ্যে। কিন্তু আমি নিশ্চিত তারা যত জোরে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজিয়ে মানুষকে বিরক্ত করেন, হৃদয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্য ততটা মমতা পোষণ করেন না। পোস্টারজুড়ে নিজের ছবি দিয়ে কোণায় বঙ্গবন্ধুকে স্ট্যাম্প সাইজ করা আওয়ামী লীগাররা বঙ্গবন্ধুকে ব্যবহার করেন নিজেদের প্রচারের জন্য। আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় না থাকলে এই হাইব্রিড মৌসুমি বঙ্গবন্ধু প্রেমিকদের টিকিটিও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

হাইব্রিড আওয়ামী লীগারদের কাছে অনুরোধ, প্লিজ সাধারণের বঙ্গবন্ধুকে সাধারণেরই থাকতে দিন। তাঁকে বিচ্ছিন্ন করবেন না। ঘাতকরা অনেক চেষ্টা করেও বঙ্গবন্ধুকে ইতিহাস মুছতে পারেনি। আর সবার মরদেহ বনানীতে কবর দিলেও ঘাতকরা বঙ্গবন্ধুর মরদেহ নিয়ে গিয়েছিল টুঙ্গীপাড়ায়। ভেবেছিল দূরে রেখে বুঝি বঙ্গবন্ধুকে মানুষের মন থেকে মুছে ফেলা যাবে। ২১ বছর ধরে সেই চেষ্টা হয়েছেও। কিন্তু সফল হয়নি। যত দিন যাচ্ছে, বঙ্গবন্ধু আরো প্রাসঙ্গিক হচ্ছেন। টুঙ্গীপাড়া এখন জাতির তীর্থে পরিণত হয়েছে। বঙ্গবন্ধুর আদর্শ বাস্তবায়নে, তাঁর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়তে নিরলস কাজ করে যাচ্ছেন তাঁর কন্যা শেখ হাসিনা। শুধু বাংলাদেশ নয়, বঙ্গবন্ধু আসলে গোটা বিশ্বের নিপীড়িত, নির্যাতিত মানুষের অনুপ্রেরণার অনন্ত উৎস।

ঘাতকরা চেষ্টা করেছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধুকে যে মুছে ফেলা যাবে না, সেটা অনেক আগেই জানতেন অন্নদাশঙ্কর রায়। তিনি লিখেছেন, যতকাল রবে পদ্মা যমুনা গৌরী মেঘনা বহমান, ততকাল রবে কীর্তি তোমার শেখ মুজিবুর রহমান...